সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে বাঁচতে শিখি

ডা. ম রাশিদুল হক

সিজোফ্রেনিয়া শব্দটি শিক্ষিত সমাজে অতি পরিচিত। আর এইসব রোগী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে "পাগল" বলে নিগৃহীত। পাগল শব্দটির সাথে স্টিগমা বা নেতিবাচক ধারণা জড়িত। এই নেতিবাচক ধারণার পিছনে রোগী সম্পর্কে মানুষের ভয়, অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধারণা ও ভিন্নভাবে দেখা (discrimination) দায়ী।

সিজোফ্রেনিয়া শব্দটির উৎপত্তি "সিজম" (Schism) থেকে। সিজম অর্থ বিভাজন। চিন্তা, আবেগ ও আচরণের মধ্যে যে বিভাজন তাকে সিজম। ১৯১১ সালে ইউজেন ব্লুউলার (Eugen Bleuler) প্রথম "সিজোফ্রেনিয়া" শব্দটি ব্যবহার করেন। আদিকাল থেকেই মানবজাতি এই রোগের শিকার। প্রাচিন মিশরীয়, হিন্দু, চাইনিজ, গ্রিক এবং রোমান যুগে অনেক লিখনীতে এই রোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে (৫ম থেকে ১৫তম শতক) এসব রোগীদের ওপর অশুভ আত্মা বা অশুভ শক্তি ভর করেছে বলে মনে করা হতো।

১৮৮৭ সালে ইমিল ক্রেপলিন (Emil Kreaplin) প্রথম সিজোফ্রেনিয়াকে পৃথক মানসিক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে Kahlbaum (১৮৬৩), Hecker (১৮৭১), Kurt Schneider, Leonhard, Jespers, Langfeldt সিজোফ্রেনিয়া রোগের জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন।

পরিসংখ্যান

লিঙ্গভেদে পুরুষ ও মহিলাদেস সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার অনুপাত সমান। ১০ থেকে ২৫ বছরে ছেলেরা এবং ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সে মেয়েরা প্রথম এ রোগে আক্রান্ত হয়। তবে ৪০ বছরের পরে ৩-১০% মহিলার সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। পৃথিবীতে মোটামুটি ১% রোগী সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। ১০ বছর পূর্বে এবং ৬০ বছরের পরে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ৯০% সিজোফ্রেনিয়া রোগীর বয়স ১৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে।

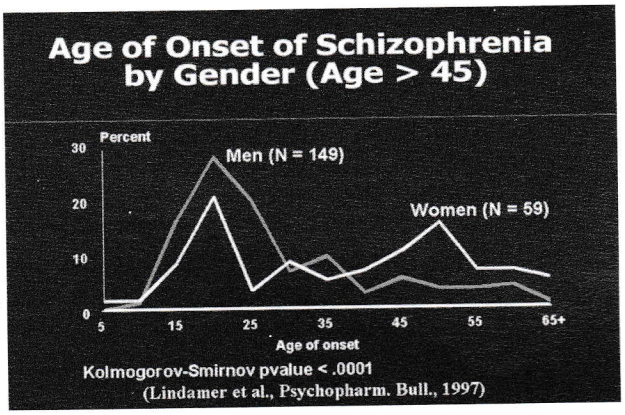

কেন সিজোফ্রেনিয়া হয়?

কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে সিজোফ্রেনিয়া হয় না। এই রোগটি জিনগত, পরিবেশগত, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, জৈবিক বা স্নায়ু-রসায়নের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার ফলাফল।

বাবা-মায়ের একজনের সিজোফ্রেনিয়া হলে ১২% এবং দুই জনের হলে ৪০% ক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাই-বোনের সিজোফ্রেনিয়া হলে ৮% ক্ষেত্রে হতে পারে।

ডোপামিন, সেরোটোনিন, গ্লুটামেট নিউরোট্রান্সমিটারের বিপর্যয় এই রোগের কারণ হিসাবে দেখা হয়, যা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের মূল লক্ষ্যবস্তু।

গাঁজার নেশা, ইনফ্লুয়েঞ্জা পান্ডেমিক ইনফেকশন, প্রসুতিকালীন জটিলতা, পিতার বয়স পরিবেশগত কারণের মধ্যে অন্যতম।

সিজোফ্রেনিয়ার প্রকারভেদ

DSM-৫ অনুযায়ী, সিজোফ্রেনিয়ার কোন প্রকারভেদ নাই। সিজোফ্রেনিয়া স্পেকট্রাম এই আমব্রেলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ, যা মৃদু হতে প্রকট, সবকিছুর সমষ্টি।

ICD-১০ অনুসারে সিজোফ্রেনিয়া নিম্নরূপ:

১। প্যারানোইড সিজোফ্রেনিয়া
২। হেবেফ্রেনিক বা ডিসঅরগানাইজড সিজোফ্রেনিয়া
৩। কেটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া
৪। আনডিফারেনটিয়েটেড সিজোফ্রেনিয়া
৫। রেসিডুয়াল সিজোফ্রেনিয়া
৬। সিম্পল সিজোফ্রেনিয়া

প্রতিটি টাইপের সিজোফ্রেনিয়া নির্দিষ্ট উপসর্গ নিয়ে প্রকাশিত হয়।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর উপসর্গ

এইসব রোগী তাদের অরূলক চিন্তা বা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অস্বাভাবিক অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যা তাকে সামাজিকভাবে গুটিয়ে যেতে বা অনিয়ন্ত্রিত আক্রমণাত্মক আচরণের কারণ হতে পারে।

অনেক রোগী সম্পূর্ণ ভালো মনে হয়, যতক্ষণ না তারা কথা বলে - কথা বলার মধ্যদিয়েই তার অস্বাভাবিক চিন্তা বা অমূলক দৃঢ় বিশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই রোগীদের তার রোগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি থাকে না।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর লক্ষণগুলো পজিটিভ ও নেগেটিভ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

পজিটিভ উপসর্গসমূহ

- ভ্রান্ত বিশ্বাস (Delusion)
- অমূলক বা অস্বাভাবিক অনুভূতি (Hallucination)
- অস্বাভাবিক কথাবার্তা
- অস্বাভাবিক আচরণ বা কেটাটোনিক আচরণ

নেগেটিভ উপসর্গসমূহ

- সামাজিকভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া
- চুপ করে থাকা বা কথা কম বলা
- ভাবলেশহীন
- কোন কাজ-কর্ম করার আগ্রহ না থাকা
- বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা কমে যাওয়া

একা একা হাসা, কথা বলা, নিজের চিন্তাগুলোকেও বাহির থেকে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া বা বের করে নেওয়া বা নিজের চিন্তাগুলো সবাই জেনে ফেলা, নিজের আবেগ-অনুভূতি-চিন্তা বা কাজ বাহির থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সিজোফ্রেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত।

বুদ্ধিবৃত্তিক উপসর্গ

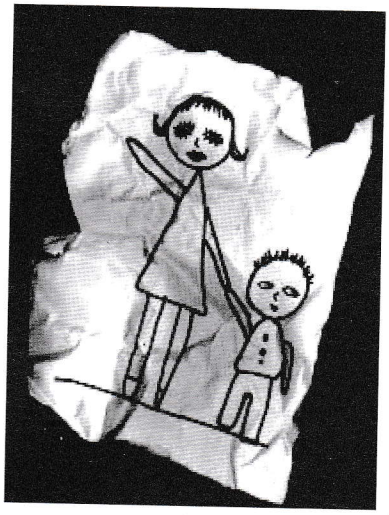

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় না বা হলেও তা খুব সামান্য। কিন্তু বারবার রোগের পুনরাবৃত্তি বা রোগের গতিপথ দীর্ঘায়িত হলে বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যা তার স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

আবেগীয় উপসর্গ

এইসব রোগী বেশিরভাগ সময় বিষণ্নতায় ভোগে, যা রোগীর আত্মহত্যার মূল কারণ। রোগীর রাগ বা আবেগহীনতা তার রোগের উপসর্গ।

রোগ নির্ণয়

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য একক কোন পরীক্ষা নেই। রোগীর ইতিহাস, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ও মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করে এই রোগ নির্ণয় করতে হয়, যা একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক করে থাকেন।

বলে রাখা ভালো অতি মাত্রার স্ত্রিজোফ্রেনিয়া নির্ণয় করা একপ্রকারে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা (যেমন সিটি স্ক্যান অফ ব্রেইন) করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা অন্য রোগ পৃথক করতে সহায়তা করে থাকে।

চিকিৎসা

সিজোফ্রেনিয়া রোগটি একটি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল ও বিপর্যয়কর মানসিক রোগ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের খুশির ব্যাপার হলো, এই রোগের অনেক কার্যকর ওষুধ ও মনোসামাজিক চিকিৎসা রয়েছে। ওষুধ দিয়ে চিকিৎসাই এখনও সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মুখ্য চিকিৎসা। ওষুধ ও মনোসামাজিক চিকিৎসা একত্রে করলে রোগীর উপশম কার্যকরভাবে করা যায়।

এই রোগীদের মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। রোগ নির্ণয়, রোগীর ও তার পরিবার-আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তা, ওষুধের মাত্রা নির্দিষ্টকরণ (স্টাবিলিজেশন) এবং তীব্র (acute illness) রোগের উপসর্গ থাকা অবস্থায় রোগীর ভর্তি চিকিৎসার অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

ওষুধ

১৯৫২ সালে প্রথম সিজোফ্রেনিয়া রোগটির ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। এগুলোকে "ওল্ড জেনারেশন অ্যান্টি-সাইকোটিক" বলে। যেমন ক্লোরপ্রমাজিন, ফ্লুফেনজিন, পারফেনজিন, ট্রাইফ্লুওপেরাজিন, হেলোপেরিডল ইত্যাদি।

১৯৯০ সালের পর কিছু নতুন ওষুধ বাজারে আসে, এদের "নিউ জেনারেশন অ্যান্টি-সাইকোটিক" বলে। যেমন রিস্পেরিডন, অলাঞ্জাপিন, কিউটিয়াপিন, জিপ্রাসিডন, অ্যারিপ্রিপ্রাজল, পালিপেরিডন, ইলোপেরিডন ইত্যাদি।

মনোসামাজিক চিকিৎসা

১. ফ্যামিলি সাইকো এডুকেশন
২. সামাজিক দক্ষতা অর্জন
৩. কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি
৪. সহযোগিতাপূর্ণ কর্ম
৫. একক সাইকোথেরাপি
৬. গ্রুপ সাইকোথেরাপি
৭. একইসাথে বিদ্যমান নেশার সামগ্রিক চিকিৎসা
৮. অসুস্থতা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
৯. স্ব-উদ্যোগী (এসারটিভ) সামাজিক চিকিৎসা
১০. সেলফ হেল্প গ্রুপ
১১. পুনর্বাসন

মনোসামাজিক চিকিৎসা রোগীর প্রাত্যহিক জীবনের রোগের চ্যালেঞ্জ (যেমন অন্যের সাথে যোগাযোগের সমস্যা, নিজের যত্ন, কাজ-কর্ম এবং সম্পর্ক তৈরি ও ধরে রাখার দক্ষতা) মোকাবেলায় সহায়তা করে। নিয়মিত মনোসামাজিক চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর ওষুধ খাবার প্রবণতা বেশি এবং তাদের পুনরায় রোগের প্রাদুর্ভাব ও হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

রোগের পরিণতি

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর পরিণতি অনেক শারীরিক রোগ (যেমন ক্যান্সার, মটর নিউরন ডিজিজ, এসএলই) থেকে ভালো। ২৫% রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, ৩৫% রোগী প্রতিবার অ্যাটাকের পর স্বাভাবিক জীবন যাপন করে কিন্তু রোগের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে, ২৫% রোগী কিছু রোগের উপসর্গ নিয়ে অন্যের সহায়তায় বসবাস করে, ১০% রোগী দীর্ঘমেয়াদি ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে, যা কর্মহীন ও পরাধীন জীবন যাপনের নামান্তর।

সিজোফ্রেনিয়ার ১০%-১৫% রোগী অল্প বয়সে মারা যায়, যার প্রধান কারণ আত্মহত্যা।

উপসংহার

সিজোফ্রেনিয়া একটি চিকিৎসাযোগ্য রোগ। পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ রোগী এই রোগ নিয়ে বসবাস করছে। ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা এই রোগের উপসর্গ কমায় এবং বাড়িতে, কর্মস্থলে এবং স্কুলে কাজ করার যোগ্য করে তোলে। সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা সিজোফ্রেনিয়া রোগীর চিকিৎসাকে বাধাগ্রস্ত করে। রোগ সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা, রোগীর চিকিৎসা ও পারিবারিক সহযোগিতা এই রোগীদের সমাজের মূল স্রোতে চালিত করতে পারে। বেঁচে থাকার অধিকারই মূল কথা নয়, কাজ করার সুযোগ এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অবদানপূর্ণ জীবন-ই এই রোগীদের লক্ষ। তাই ২০১৪ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য - 'সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে বাঁচতে শিখি'।

Registrar, Department of Psychiatry,
Dhaka Medical College & Hospital